শিক্ষায় দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ

১৬ জানুয়ারির পর কোনো কলাম আর লিখিনি। কোনোক্রমেই লেখায় মন বসাতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম, লিখে যদি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি না করতে পারি, সংশ্লিষ্ট পক্ষ যদি লেখাগুলো আমলে না নেয়, কারো ভাবনার উদ্রেক যদি না করে, লিখে কী লাভ! এদেশে আমরাই-বা কে! আমাদের তো একচোখা হয়ে তোয়াজ করে কোনো দলভূক্ত হওয়ার যোগ্যতা নেই, জানি। আজকের পত্রিকার পাতা আগামীকালের ঝালমুড়ি-চানাচুর বিক্রির ঠোঙ্গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমার পরিশ্রম ও ভাবনা নিত্য ডাস্টবিনে গড়াগড়ি খায় ভেবে লিখতে অনিচ্ছুক ছিলাম। এর মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে। তাই মনকে আবার প্রবোধ দিয়ে আজকে কলম ধরেছি। গত লেখার শিরোনাম ছিল 'চাই জীবনমুখী, মানবিক ও কর্মমুখী শিক্ষা' (যুগান্তর, ১৬.০১.'২৪)। এ বিষয় নিয়ে নাতিদীর্ঘ কথা বলেছিলাম। এছাড়া অনেকদিন ধরে এদেশের উপযোগী শিক্ষা বিষয়ে 'শিক্ষার ভিত্তিমূল কি হওয়া উচিত', 'শিক্ষার উপকরণ'সহ সামাজিক শিক্ষা ও শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে অনেক কথাই লিখেছি। এসব লেখা সংশ্লিষ্ট মহলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে কি-না, তা আমার অজানা। আমার ধারণা, এদেশের বাঙালিদের ইংরেজ, আমেরিকান, ভারতীয়, চীনা কিংবা অন্য কোনো ভীনদেশী না বানানো পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না। এতে আমাদের জাতীয় গর্ব ও অস্তিত্ব ক্রমশই বিলীন হতে বাধ্য। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, এ মহাদেশের বেশ কিছু জাতি কালপরিক্রমায় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কিছু জাতি অসহায় ও এতিমের মতো নিঃসাড় হয়ে নিঃসীম ভবিষ্যতের অতল গর্ভে হারিয়ে যেতে বসেছে। পড়ে পড়ে ধুঁকছে। আমরা একটু চোখ তুলে তাকালেই সব দেখতে পাব। এর সাথে 'যোগ্যতমের টিকে থাকা' কথাটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এখানেই আমরা ভুল করি। অতপর অদৃষ্টের উপর দোষ চাপিয়ে হা-হুতাশ করে সামনের দিনগুলো পার করি, যদিও এসবই প্রকৃতির প্রতিশোধ। এসব চিন্তাভাবনা রাষ্ট্রনায়ক ও দেশ পরিচালকদের সবসময় করা প্রয়োজন। এ সবকিছুই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। শিক্ষা আবার নির্ভর করে দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবেশের উপর। যে জাতি যত শিক্ষিত ও উন্নত, বিশ্বসভায় তার মর্যাদা তত উচ্চ ও টেকসই।

আমাদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। আছে আলাদা মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা, সামাজিক বুনন– যা এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকেও স্বতন্ত্র। এসব কিছু ভুলে গেলে কিংবা এড়িয়ে গেলে আমরা অন্য কোনো সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, সমাজ-স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবোধের সাথে কালক্রমে মিশে যাব। এর থেকে দুঃসংবাদের কথা আর কী থাকতে পারে! আমরা বিশ্বের দরবারে স্বকীয় সত্তায় পরিচিত হতে চাই, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই, নিজস্ব শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পারঙ্গমতায় ও সক্ষমতায় টিকে থাকতে চাই।

গত দুদিন ধরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১' বইখানা মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। আমার কাছে এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও শিক্ষাক্রমের অ্যাপ্রোচ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের ভিত্তিও যথাযথ বলে মনে হলো। দার্শনিক ভিত্তি আলোচনায় এসে দেখলাম, 'শিক্ষার্থীর শিখন হতে হবে আন্তঃবিষয়ক, সমন্বিত এবং প্রক্রিয়া হবে মিথস্ক্রিয়ামূলক'– এগুলো ভালো ভিত্তি। উল্লেখ করা হয়েছে, 'শিক্ষাবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হলো– গঠনবাদ ও পুনর্গঠনবাদ। গঠনবাদ অনুযায়ী শিখনের মূল উদ্দেশ্য হলো পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে অভিযোজনের জন্য অভিজ্ঞতা অর্জন করা। আর পুনর্গঠনবাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার্থী অভিযোজনের জন্য সামাজিক শিখন পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত মিথস্ক্রিয়া ঘটায় এবং এর ফলে শিক্ষার্থী ও শিখন পরিবেশের উভয়ের মাঝেই পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনের এই অভিজ্ঞতাই শিক্ষাথীর শিখনের ভিত্তি তৈরি করে।'– বেশ গ্রহণযোগ্য কথা। তবে আমাদের দেশে কি 'সামাজিক শিখন' আছে? 'প্রগতিবাদ ও পুনর্গঠনবাদকে মূল দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রূপরেখার কাঠামো ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।' এই বর্ণনায় 'প্রগতিবাদ' শব্দটার ব্যবহারের সাথে সম্পূর্ণ একমত হতে পারলাম না। 'প্রগতিবাদ' শব্দটা বিভিন্ন দেশে ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়। 'প্রগতিশীল' শব্দটাও ভালো। কে না চায় প্রগতিশীল হতে!

বিশ্বে নতুন নতুন মতবাদের আভাব নেই। সব মতবাদ এদেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সামাজিক মননশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নয় সামাজিক মূল্যবোধের অনুগামী। পশ্চিমা বিশ্ব প্রগতিবাদকে এক চোখে দেখে; এদেশের সুশিক্ষিত সমাজ কিন্তু প্রগতিবাদ শব্দটাকে ভিন্ন চোখে দেখে। আমি পশ্চিমা বেশ কয়েকটা দেশে ঘুরেছি। লেখাপড়ার জন্য সেখানে থাকতেও হয়েছে। তাদের অনেক কিছুই আমার চোখে ভালো লেগেছে। আবার তাদের অনেক কিছু আমার চোখে বিশ্রী ও বিকৃত রুচিবোধ বলে মনে হয়েছে। আমরা পোশাক পরি শরীরকে আবৃত করার জন্য। ঐসব দেশে বাজারে কাপড়ের অভাব নেই, কিন্তু শরীর ঢাকতে কাপড়ের বড্ড অভাব। উলঙ্গতা ও বিকৃত যৌনাচারের মধ্যে কী সভ্যতা লুকিয়ে আছে আমি অনেক গবেষণা করেও তা খুঁজে পায়নি। এজন্য আমাকে ব্যাকডেটেড বা প্রগতিবিরোধী বলতে পারেন, কিন্তু আমি অর্ধোলঙ্গ হয়ে প্রগতিশীল হতে চাইনে। ঐসব দেশের বাসে, ট্রেনে, মেট্রোতে চড়তে গিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে জনসমক্ষে বিকৃত যৌনাচারের রিহার্সল দেখেছি, কিন্তু একবার দৃষ্টিগোচর হলেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মনে মনে অন্য কোনো চতুষ্পদের সাথে তুলনা করেছি। এগুলো দেখলেই আমার বিকৃত রুচির কথা মনে পড়ে এবং মনে হয় মানবসভ্যতা কোনো কোনো দিক দিয়ে আদিমতা ও অসভ্যের যুগে ফিরে যাচ্ছে। আমরা কর্ম ও ভাবনা দিয়ে মানব সভ্যতাকে ভূলুণ্ঠিত করছি। পশ্চিমা সব মতবাদ সব দেশের জন্য পালনীয় নয়। চলতি ফ্যশনের মতো। নিত্যনতুন অনেক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, মানবসভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কোনো মতবাদ টিকে আছে, আবার অনেক বিকৃত মতবাদ কালের আবর্তে সময়ের পরিক্রমায় হারিয়ে গেছে। সামাজিক মতবাদ ছাড়াও অনেক রাজনৈতিক মতবাদেরও একই দশা। সেজন্য আমরা এদেশে কুহেলিকার পেছনে ছুটে সময় নষ্ট করতে চাইনে; প্রগতিবাদের মোড়কে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিকৃত মানবিকতা, প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্মপদ্ধতি ও জীবনাচার দেশে প্রবর্তন করতে চাইনে। নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন হতে দিতেও চাইনে। এদেশীয় অকৃত্রিম বাঙালির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ে আমাদের স্বকীয় সক্ষমতাকে জানান দিতে চাই। এর মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও মঙ্গল নিহীত আছে। এদেশের অনেক ব্যক্তি উচ্চশিক্ষার নামে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লেখাপড়া করেছেন। তারা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেশীয় স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমা ধাচের বাঙালি বানাতে চান, এখানেই তাদের সাথে আমার বিরোধ।

একটা ছোট্ট স্মৃতিচারণ না করে পারছি না। ছোটবেলা থেকেই কবিতা আমার খুব ভালো লাগতো। আমার এক চাচা কবিতার সমঝদার ছিলেন। একদিন একটা কবিতা লিখে তাঁকে দেখাতে নিয়ে গেলাম। তিনি ভালোভাবে পড়লেন, প্রশংসা করলেন। বললেন, 'তোমার কবিতার ধারা এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অন্য কেউ কবিতাটা পড়লে রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা ভাববেন। তুমি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা, সুকান্তের কবিতা, জসিমউদ্দীনের কবিতা, জীবনানন্দ দাসের কবিতা ভালো করে পড়বে। দেখবে প্রত্যেকের কবিতারই একটা স্বকীয় ধারা বিদ্যমান। তুমি যা লিখছো তাতে সবাই তোমাকে রবীন্দ্রনাথের সার্থক অনুকারক বলবে। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গেলে তোমার নিজস্ব একটা ধারাকে বেছে নিতে হবে।' আমি আমার জীবনে কবিতায় নিজস্ব ধারা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছি। তাই আজীবন অন্যের কবিতা পড়েছি, কিন্তু নিজে কবিতা লেখা সেদিন থেকে ছেড়েছি। নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে অন্যের অস্তিত্বকে আকড়িয়ে ধরে পৃথিবীতে টিকে থাকা অনর্থক। পশ্চিমা সভ্যতা কিংবা কোনো মতবাদের ভালো দিকগুলোকে আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের গণ্ডির মধ্যে এনে এদেশের উপযোগী করে গ্রহণ করতে পারি। হুবহু কাট অ্যান্ড পেস্ট করতে আমার আপত্তি। শিক্ষা নিয়ে আমার আরেকটি কথা আজ বলতে চাই।

বাস্তবতা হলো, এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেশের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী কারো পক্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির প্রতিটা বই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে দেখা ও রূপকল্প তৈরি করা সম্ভব নয়, যদিও সব কর্মের দায়দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে এসে বর্তায়। শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরির জন্য যাদের ওপর দায়িত্ব বর্তায়, তাদের মধ্যে কারো কারো মাথা মোটা ও বিকৃত বাতিল চিন্তা-চেতনা ও মতবাদে মদদপুষ্ট ও পক্ষপাতদুষ্ট। তারা তাদের নিজস্ব বাতিল ধ্যানধারণাকে এদেশের পুরো জনগোষ্ঠীর ওপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনীনভাবে চাপিয়ে দিতে চায়। গলদটা

এখানেই; 'কাজ করে বেহদ্দ, মার খায় গোষ্ঠীসুদ্ধ'। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরিতে এদেশের সংস্কৃতি, সামাজিক চেতনা, মূল্যবোধ ও সামাজিক বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে পদ্ধতি ও বিষয় নির্বাচন করলেই কোনো ঝামেলা থাকে না ও বিতর্কও তৈরি হয় না।

ট্রান্সজেন্ডার ও থার্ড-জেন্ডার নিয়ে যে বিতর্ক দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে, আমার দৃষ্টিতে এটা একটা পক্ষসৃষ্ট। একটা পক্ষ এর বিরোধিতা করছে, আরেকটা পক্ষ বিভিন্ন সংগঠনের ছায়াতলে এর মধ্যেও মৌলবাদের গন্ধ আবিস্কার করে মৌলবাদ পতনের জয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে। এসবের আদৌ কি দরকার ছিল? আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে অপরিণামদর্শী হয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে জাতিকে বিভক্ত করে ফেলেছি। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের থার্ড-জেন্ডারদের সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া শেখানো খারাপ কিছু নয়। এক্ষেত্রে এ সামাজিক সমস্যার সমাধানও তাদের শেখানো যেতে পারে। কিন্তু ঐ বয়সের ছেলেমেয়েকে ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে ধারণা দেওয়া কি যৌক্তিক ও সময়োপযোগী? আবার ট্রান্সজেন্ডার শব্দটাকে থার্ড-জেন্ডার বলে চালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা কি সংগত? এ নিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টারই-বা কী আছে? কোনো বিষয়ে তর্ক করে জয়ী হওয়াটা বড় জয় নয়, আত্মজিজ্ঞাসায় জয়ী হওয়াটাই প্রকৃত বিজয়। আমাদের দেশের কিছু জ্ঞানবিধ্বস্ত বুদ্ধিজীবীর বাতিল মতবাদ ও দলবাজি মনোভাবের পরিবর্তে মনে প্রকৃত দেশাত্ববোধের জন্ম নিলেই দেশের অনেক উপকার হতো বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বারবার এ কলামে লিখছি, পাঠ্যসূচি নিয়ে আমাদের খুব একটা সমস্যা নেই। পাঠ্যসূচির পরিবর্তন একটা চলমান প্রক্রিয়া। এটা ব্যয়বহুলও নয়। এদেশের মানুষকে সুশিক্ষিত করার জন্যই আমরা হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে এ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরি করেছি। চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কি কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন সেটা আমরা বিবেচনায় আনতে পারি। জেদাজেদি না করে গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারি। আমি জানি মূল সমস্যা শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। ভিজা-স্যাঁতসেঁতে মাটিতে জন্মানো কচুর ডাটা রান্না করতে গেলে সহজে সিদ্ধ হবে না, আবার মুখ চুলকাবে। কচুর ডাটা কেনার সময় এটা ভাবা দরকার ছিল। কাজ করার সময় আমরা ভবিষ্যতকে নিয়ে আদৌ ভাবি না, পরে কম পড়লে টের পাই। শিক্ষক গোষ্ঠীর অধিকাংশই শিক্ষায় দুর্বল। ভালো ছাত্রছাত্রী প্রাইমারি, হাইস্কুল ও কলেজ শিক্ষার শিক্ষকতা পেশায় আসেননি। নিয়োগ ব্যবস্থায়ও গলদ আছে। শিক্ষা-প্রশাসনেরও ঢালাওভাবে রাজনীতিকরণ হয়ে গেছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের দারুণ ঘাটতি। তাছাড়া ভালো শিক্ষক ছাড়া পরিকল্পনামতো ও ভালোমতো শিক্ষা দেবেন কীভাবে? প্রায় স্কুল ও কলেজ কমিটিতেই পোকায়-খাওয়া রাজনৈতিক আধিপত্য বিরাজমান। রাজনৈতিক পাতি-নেতাদের অন্যায্য অত্যাচারে শিক্ষাঙ্গন, হেডমাস্টার ও অধ্যক্ষরা অতিষ্ঠ। শত শত হেডমাস্টার ও অধ্যক্ষের সাক্ষাতকার আমি নিয়েছি। স্বজাতি বলেই হয়তো তাঁরা মনের কথাটা আমাকে বলেন। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা খুব কঠিন সময় পার করছি। আমরা শিক্ষার মানোন্নয়ন চাই; কিন্তু বাস্তবতা বিরূপ। তবে হতাশা আমাকে বেশিক্ষণ আচ্ছন্ন করতে পারে না। এ থেকে বেরিয়ে আসার পথও আমরা খুঁজে পেয়েছি, মান বাড়ানোরও কৌশল আছে। প্রয়োজন সরকারের আন্তরিকতা, সদিচ্ছা এবং আমাদের সুচিন্তিত ব্যবস্থা ও কৌশলকে কাজে লাগানো।

(৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ